# ডাবল স্ট্যান্ডার্ড


**ডা. শামসুল আরেফীন**

এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)

সহকারী সার্জন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়



শারঈ নিরীক্ষণ

**মুফতি আবু সালেহ মোহাম্মদউল্লাহ**

শিক্ষাসচিব ও সিনিয়র মুহাদ্দিস

মিরপুর কেন্দ্রীয় মসজিদ ও জামি'আ মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া মাদরাসা কমপ্লেক্স

পরিচালক, মাদরাসা মারকাযুস সুন্নাহ তাহিয়্যাতুত তুল্লাব, পল্লবী, মিরপুর-১২

খতিব, বাইতুত তাকওয়া জামে মসজিদ, মিরপুর,ঢাকা।



মাকতাবাতুল আযহার

# ভূমিকা

সব রকমের প্রশংসা আল্লাহরই যিনি একাই সবকিছু করেছেন, করবেন।

অগণিত দরুদ ও সালাম চির-আধুনিক মহামানবের জন্য যাঁকে না মুসলমানরা চিনলাম, আর না অমুসলিমদের চেনাতে পারলাম।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আর কয়েকজনকে দুআ না করলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমার সহোদর শুভ্র সালেহ এই বইটার স্বপ্নদ্রষ্টা, বলেছিল ডায়েরির টুকে রাখা চিন্তাগুলোকে মলাটে বাঁধতে; অভিভাবকপ্রতিম আব্দুল্লাহেল বাকী ভাইয়ের কাছে পেয়েছি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা; আমার স্ত্রীর উৎসাহ ও দুআ তো ছিলই। ছোটবোনটাও ছিল গল্পের পাঠিকা, যদিও কিছু বুঝতো কিনা আমার সন্দেহ আছে। আরও ধন্যবাদ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আযহারী সাহেবকে যিনি এই ছাইপাশকে প্রকাশের যোগ্য বিবেচনা করেছেন। ধন্যবাদ মুফতি আব্দুল্লাহ আল ফারুক, মুফতি রাইহান খাইরুল্লাহ ও মাওলানা আতীকউল্লাহ সাহেবান হাফিজাহুমুল্লাহকে যাঁরা পছন্দ করে অনুমোদন করেছেন এই বইকে। ব্যস্ততার মাঝেও যিনি প্রতিটি শব্দ নজরে ছানী করে দিয়েছেন মুফতি আবু সালেহ মোহাম্মদউল্লাহ সাহেব হাফিযাহুল্লাহকে এবং প্রচ্ছদকার আবুল ফাতাহ মুন্না ভাইকে হৃদয় নিংড়ানো দুআ। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে আহসানুল জাযা, সর্বোত্তম বদলা দান করুন। আমিন।

ইসলামের প্রতিটি বিধানই কল্যাণময়। কখনও কোন বিশেষ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কল্যাণময়। আবার কখনো বিশেষ বিষয়ে কল্যাণ আপাতভাবে ধীরগতির (slow dose) হলেও সামষ্টিকভাবে কল্যাণ স্পষ্ট। এজন্য কখনো কখনো মনে হতে পারে যে ইসলামের বিধান এমন কেন? বা এটা ইসলামে অনুমোদিত কেন? গভীর চিন্তা করলে বুঝা যায়, যদিও একপক্ষ বিচারে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ আছে বলে মনে হয়; কিন্তু সামগ্রিকতা বিচারে দেখা যায় এর চেয়ে সুন্দর ও কল্যাণময় বিধান আর হতেই পারেনা। ডাক্তারি ভাষায় বললে, ওষুধের যেমন সাইড এফেক্ট থাকে, আমাদের তৈরি

সমাধানগুলো এমন। একটা সমাধান করতে গেলে আরেকটা সমস্যা তৈরি হয়। কিন্তু ইসলামের বিধান সাইড-এফেক্টমুক্ত; যদিও কখনো দ্রুত, কখনো ধীর; কিন্তু সামগ্রিক রোগ আরোগ্য হবেই নো ডাউট। কেননা এ বিধান এসেছে এমন একজনের কাছ থেকে যিনি মানবজীবনের ও মানবসমাজের স্রষ্টা, সমস্যারও স্রষ্টা, ফলাফলেরও স্রষ্টা। তাই সমাধান তার চেয়ে ভাল আর কে দেবে?

প্রথমত, বইটা লেখা আমার নিজের হিদায়াতের জন্য। যাতে ইসলামের যে বিধানগুলোতে বিদ্বেষীমহল সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে, সেগুলোতে আমার নিজের বিশ্বাস আরো পাকাপোক্ত হয়। আর ইসলামের বিধানে যুক্তি খুঁজতে যাবার দুঃসাহস দেখাইনি, যেটা খুঁজতে গিয়েছি সেটা হল– কল্যাণ। শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী মাদানী রহ. এর একটি কথা আমাকে এ কাজে প্রেরণা দিয়েছে :

*"পবিত্র শরীয়তের প্রত্যেকটি হুকুমের মধ্যে যেমন সীমাহীন খায়ের-বরকত ও সওয়াব রহিয়াছে, তেমনিভাবে উহার মধ্যে বহু প্রকার কল্যাণও নিহিত রহিয়াছে। যাহার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার; কারণ আল্লাহ তাআলার অসীম জ্ঞান ও উহার মধ্যকার কল্যাণ উদঘাটনের সাধ্য কাহার আছে? তথাপি নিজ নিজ যোগ্যতা ও হিম্মত অনুপাতে প্রত্যেকের জ্ঞানের পরিধি হিসাবে উহার কল্যাণও বুঝে আসে। যাহার যত যোগ্যতা বেশি হয় ততই শরীয়তের হুকুমে নিহিত গুণাগুণ ও উপকারিতা বুঝে আসিতে থাকে।" (ফাযায়েলে আমাল, পৃষ্ঠা ৭৬)*

তার মানে শরীয়তের হুকুমের কল্যাণ বুঝা সম্ভব। অধমের স্বল্পজ্ঞান ও অযোগ্যতা নিয়ে এ কাজ করার উদ্দেশ্য একটাই– যদি কোন জ্ঞানী ও যোগ্য ব্যক্তি পর্যন্ত আমার এ আহবান পৌঁছে, না জানি তাঁর গবেষণা থেকে কত রহস্য উম্মত জানতে পাবে, না জানি কত দুর্বল মুসলিমের ঈমান বেঁচে যাবে।

দ্বিতীয়ত, মনে হয়েছে অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও বাকস্বাধীনতার নষ্টামীর এই যুগে এমন কিছু ভাবনার সংকলন দরকার যা প্রতিটি মুসলিমের সংগ্রহে থাকা চাই। কেননা প্রাচ্যবিদদের (বিধর্মী ইসলামগবেষকদের) পুরনো প্রলাপই নতুন মোড়কে আসছে। সেই জংধরা অস্ত্রেই ঘায়েল হচ্ছে আমাদের সন্তানদের অপক্ব দুর্বল ঈমান। মূলত বইটা আগে আমাদেরই জন্য লেখা, ওদের জন্য পরে। সামান্য এই ক'টা বিষয় সম্পর্কে প্রতিটি মুসলমানেরই বিস্তারিত ধারণা থাকা খুব খুব খুব দরকার, আজকের দিনে। আর শেষ দুটো গল্প তো শুধুই আমাদের জন্য। *'মাগদূব ও দ্বোয়াল্লিন'*–এর পথে যারা আমরা হেঁটে *'আন'আমতা আলাইহিম–'*এর পথ ছেড়ে দিয়েছি।

তৃতীয়ত, ওদেরকে আমি দুইভাগে ভাগ করি– তৎসম নামধারী আর আরবি নামধারী। তৎসম নামধারীরা হিন্দুধর্মের বিকৃতি ও অসাড়তা বুঝে নাস্তিকতা অর্জন করেছেন। ইসলামকেও ঐরকমই কিছু একটা ভেবে নিয়েছেন, বা আরবি নামধারী নাস্তিকদের চোখেই ইসলামকে চিনে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করছেন। এই বই ওনাদের জন্যও। কারণ তাঁরা আসলেই সত্য খুঁজতে যেয়ে নাস্তিক হয়েছেন। তৎসম নামের নাস্তিকরা সত্যের অনেক কাছাকাছি। ওনাদের জন্য আমার বুকভরা দুআ। আর একটু বন্ধু, এই সামনের মোড়ের পরেই তোমার গন্তব্য।

চতুর্থত, আরবি নামধারী নাস্তিক। এনাদের নাস্তিকতা অর্জনের কারণ প্রবৃত্তি বা ঝোঁক। এমন একটা দিকে তাদের আকর্ষণ বা ঝোঁক, যা ইসলাম অনুমোদন দেয় না। হয় সে সমকামী, না হয় ব্যভিচারী, না হয় মা-বোনকে নিয়ে যৌন ফ্যান্টাসিতে ভোগে, বা মদ-গাঁজা টানে, নয়তো বহুপুরুষগামিনী– দেখবেন কোন একটা নীতিবিরোধী ও মানবতাবিরোধী কিছুতে সে লিপ্ত যা সে ছাড়তে চায় না। এজন্যই ইসলামকে সে শত্রু হিসেবে নেয়। কারণ উপায় নেই যে। তখন তার কাজই হয় ইসলামের খুঁত খুঁজে বের করে প্রচার করা। খুঁজতে গিয়ে সে পেয়ে যায় পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের কিছু প্রলাপ, টেপ রেকর্ডার। ইসলামের দিকে তাক করা বাঁধা কয়েকটা প্রশ্ন। এর ভিতরেই তার ঘুরপাক, অপলাপ, প্রপাগান্ডা।

যেগুলোর উত্তর দিতে গিয়ে আমরা মুসলিমরা হিমশিম খেয়েছি। এড়িয়ে যেতে চেয়েছি। এসব প্রশ্ন যে আমাদের মনেও আসে না তা নয়। কেউ ইস্তেগফার-আউযুবিল্লাহ পড়ে ঈমান বাঁচিয়েছি। কেউবা উত্তর খুঁজতে গিয়ে ওদের জালেই ফেঁসে গিয়েছে। এই বই ওদের জন্যও। তবে যারা কুরআন থেকেই খুঁত খুঁজে বের করতে চায়, কুরআন যাদের হেদায়েতের কারণ হয় না; তারা এই বইয়েও খুঁত বের করবে এটাই স্বাভাবিক। ওদের জন্য আমার বুকফাটা দুআ। তবে হ্যাঁ, এই বইয়ের খুঁত গ্রহণযোগ্য হবে নিচের শর্তসাপেক্ষে :

১। আইন বিষয়ে আইন পড়ুয়ার মন্তব্য গ্রহণযোগ্য। বিজ্ঞান বিষয়ে বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির কেউ হতে হবে। একইভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের রেফারেন্স কর্তন করতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যক্তি হতে হবে।

২। দাসপ্রথা- দাসীপ্রথা এসব সমাধান জাতীয় বিষয়ে শুধু সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। বিকল্প প্রস্তাব দিতে হবে। যে উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করে ইসলাম সমাধান দিয়েছে। ঐ

# সূচিপত্র


না দেখে বিশ্বাস : মানবজন্মের সার্থকতা / ১৯
দাসপ্রথা : ঐশী বিধানের সৌন্দর্য / ২৭
দক্ষিণ হস্তমালিকানা : একটি নারীবাদী বিধান / ৪১
শস্যক্ষেত্র : সম্পত্তি, না সম্পদ? / ৬৩
জিযিয়া : অমুসলিম নাগরিকের দায়মুক্তি / ৭১
শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ : ওদের স্বপ্ন , আমাদের অর্জন / ৭৯
আরব সংস্কৃতি মানবো কেন? / ১০১
সমাধান কি মানবধর্মেই? / ১২১
বনু কুরাইযার মৃত্যুদণ্ড ও বাংলাদেশ দণ্ডবিধি / ১৩৫
পরিপূর্ণ দাড়ি : জঙ্গল নয়,ছায়াবীথি / ১৬১
বিজ্ঞান কল্পকাহিনী : শাশ্বত একত্ব (Eternal Oneness) / ১৭১

# না দেখে বিশ্বাস : মানবজন্মের সার্থকতা

অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন নাদিমের বাবা। কাঁদো কাঁদো ভঙ্গিতে পাশেই বসে আছেন তার মা। তাঁদের এই উৎকণ্ঠার কারণ নাদিম। তার বন্ধুদের মধ্যে কেউ একজন তার বাবাকে কিছু কথা জানিয়ে দিয়েছে। রমজানের এগারোটা রোজা পেরিয়ে গেলেও নাদিম একটা রোজাও রাখেনি। বাসায় সবার সাথে সেহরি খেলেও পরে ভেঙে ফেলেছে। বন্ধুদের আড্ডাতেও ধর্মীয় বিধিবিধান নিয়ে কটাক্ষ করাটা নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

নাদিমের বাবা নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ না পড়লেও রমজানে রোযা-নামায বাদ দেন না। আর জুমআর নামায তো পড়েনই। আর ওর মা অবশ্য খুব পরহেজগার মহিলা। শেষ কবে নামায কাযা হয়েছে হিসাবের বাইরে। কিন্তু ছেলেটা এমন হয়ে যাবে তা চিন্তাও করেননি তাঁরা। এমনিতে নাদিম খুব ভালো ছেলে। মহল্লায় ভদ্র ছেলে হিসেবে সুনাম রয়েছে। নটরডেম এ সেকেণ্ড ইয়ারে।

নাদিমের সামনে বসে আছেন ফারুক সাহেব। চল্লিশোর্ধ্ব, পেশায় চিকিৎসক। চেহারায় না বয়সের ছাপ আছে, না পেশার ছাপ। কিছুটা জড়সড় হয়েই বসেছেন। নাদিমের বাবাই ওনাকে নিয়ে এসেছেন। ছেলের মতি ফেরানোর প্রচেষ্টা হিসেবে নিজে কয়েক বার বুঝাতে গিয়েছিলেন। কাজ হয়নি। নাস্তিকতা বা সংশয়বাদিতা সবার আগে যে জিনিসটি কেড়ে নেয় তা হল আদব। নিজে ছাড়া বাকি সবাই পুরনো, অচল, অবৈজ্ঞানিক, গোঁড়া, যুক্তিবোধবিহীন জড়বস্তু। এই উন্নাসিকতা থেকে রেহাই পায় না কেউই।

সামনের এই ডাক্তার সাহেবটির দিকে এক প্রকার হতাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে নাদিম। সারাটা জীবন বিজ্ঞান পড়ে এতটা অবৈজ্ঞানিক মানুষ কিভাবে হয়। সুরতে-পোশাকে

মনে হচ্ছে মসজিদের হুজুর। রমজানের এই ক'দিন থেকে নাদিমের বাবা আবার মসজিদের তালিমে বসা শুরু করেছেন। সেখান থেকেই এই ডাক্তার হুজুরটি আবিষ্কার হয়েছে মনে হচ্ছে। আসন্ন বয়ানের জন্য প্রস্তুত হল নাদিম। এসব বয়ান ও আগেও শুনেছে, পুরনো অস্ত্র নিয়ে আবারো রেডি হল। যে অস্ত্রে ঘায়েল হয়েছে ওর বাবাসহ আরো কত বন্ধুবান্ধব।

- 'কেমন আছো, নাদিম?' শান্ত সমাহিত কণ্ঠে শুরুটা করলেন ফারুক সাহেব।
- 'জ্বি ভালো। আপনি?'
- 'আলহামদুলিল্লাহ, ভালো।'

এই আলহামদুলিল্লাহ নিয়েই কত বন্ধুকে ঘায়েল করেছে নাদিম। মনে মনে একবার ভাবল এখান থেকেই শুরু করবে কিনা। আবার কি মনে করে চেপে গেল। পরের ডেলিভারির জন্য অপেক্ষাই শ্রেয়।

- 'দেখ নাদিম, আমাদের একসময় অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে সৃষ্টি করে পাঠিয়েছেন। শুধু পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তারও ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের আবার তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। রমযান মাসটা বছরে একবারই আসে। এই মাসের অনেক ফযীলত আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাদেরকে জানিয়েছেন।'

ডা. ফারুক নাদিমের বাবার কাছে সব জেনেই এসেছেন। শুরুটা এভাবে করার উদ্দেশ্য হল প্রথম সূত্রটা ওপাশ থেকেই আসুক। যুক্তি উপস্থাপনের চেয়ে খণ্ডনে সুবিধা বেশি।

নড়ে বসল নাদিম। মোক্ষম সুযোগ। বহু পরীক্ষিত অস্ত্র। ভদ্রভাবেই ছুড়ে দিল বেশ। 'আংকেল, কিছু মনে করবেন না। কিছু প্রশ্ন আমায় ক'দিন ধরে ভাবাচ্ছে। স্রষ্টা আছেন তার প্রমাণ কি?'

পুরনো প্রশ্ন, পুরনো প্রলাপ। মিষ্টি হাসি মেশানো পাল্টা প্রশ্ন।

- 'স্রষ্টা নেই– তার প্রমাণ আছে তোমার কাছে? '
- 'আধুনিক বিজ্ঞান তো তাই বলছে', আত্মবিশ্বাসী ফ্লেভার।

- 'বিবর্তনবাদ কোন প্রমাণ না, প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য না [১]।এটা **জাস্ট** একটা মতবাদ (Hypothesis) যার বিপক্ষে যুক্তি-প্রমাণের অভাব নেই। হকিং সাহেবও বলেছেন, স্রষ্টাকে আমাদের প্রয়োজন নেই। তার মানে এটা প্রমাণ হয়ে যায়নি যে স্রষ্টা নেই। এ দুটো ছাড়া আর কোন কথা আছে কি তোমার কাছে স্রষ্টার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে?'

নাদিম মাথা নাড়ালো। আজকের আলোচনা একটু অন্য ধাঁচের মনে হচ্ছে। ফারুক সাহেব বলে চললেন, 'দুটোর কোনটারই চূড়ান্ত প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। আমাদের কাছে প্রমাণ মানেই হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনকিছু। কল্পনা প্রমাণ নয়। দেখা যায় বা শোনা যায় বা অনুভব করা যায় বা ঘ্রাণ বা স্বাদ এই পাঁচটা ইনপুট দিয়ে আসা জিনিসই প্রমাণ। এই পাঁচটা দিয়ে কখনোই এস্টাবলিশ করা যাবে না যে স্রষ্টা আছেন বা স্রষ্টা নেই।' নাদিমের বাবা ট্রেতে করে চানাচুর, বিস্কিট আর পিঠা নিয়ে এলেন।

- 'ধর তুমি হেলিকপ্টারে করে যাচ্ছ। হঠাৎ দেখতে পেলে একটা দ্বীপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। তোমার কি মনে হয় কেন ধোঁয়া উঠছে?'
- 'আগুন ধরেছে দ্বীপে...'
- 'এক্সাক্টলি। ধোঁয়া উঠার পেছনে দুটো কারণ ছাড়া বাকি সব কিছুকে তুমি মাথা থেকে বের করে দিবে, আগুন আর কনসার্ট এর স্মোক-মেশিন। এই কাজটা করবে তোমার অভিজ্ঞতা। এরপর তোমার লজিক যে কাজটা করবে সেটা হল আগুনকে কারণ হিসেবে রেখে স্মোক-মেশিনকে বের করে দিবে। কারণ জনমানবহীন দ্বীপে কেউ কনসার্ট করবে না এবং ফাইনালি তুমি সিদ্ধান্ত নেবে যে, এই দ্বীপে মানুষ আছে।'

'আমরা ডাক্তাররাও রোগীর রোগ এভাবে ডায়াগনোসিস করি। রোগী এসে শুধু বলবে ২ সপ্তাহ ধরে কাশি আর রাতে জ্বর-জ্বর লাগে। ব্যস, প্রায় বুঝা শেষ যক্ষ্মা হয়েছে। শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য আর ছোঁয়াচে কিনা জানার জন্য একটা কফ পরীক্ষা। পরীক্ষা করে জীবাণু দেখা গেল। কিন্তু জীবাণু দেখার আগেই ডাক্তার আলামত শুনে একটা ডিসিশানে চলে যান। এরপর নিজের সিদ্ধান্ত কনফার্ম করে নেন।

তার মানে মানবমস্তিষ্কের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল আগের অভিজ্ঞতা ও যুক্তির আলোকে একটি অপশনকে বেছে নেয়া, সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া। দেখলাম ধোঁয়া, মানুষ না দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম যে ওখানে একজন বিপদগ্রস্ত মানুষ আছে।

# দাসপ্রথা : ঐশী বিধানের সৌন্দর্য

কোন এক সরকারি কসাইখানা। শিক্ষানবিস কসাইরা এখানে ছুরি-চাপাতি ধার দেয়া শেখে। বাবা-মা ছেড়ে ডালের শরবত আর ভাত সাথে ছারপোকার কামড় মাখিয়ে খায়। আর চাপড় দিয়ে মশা মারার তালে তালে রাত জেগে কসাইবিদ্যা শেখে। আর গজ গজ করে প্রতিজ্ঞা করে, নিজের ছেলেমেয়েকে আর এ বিদ্যে শেখাবে না। পাবলিকের গালি খাওয়ার জন্য এত পড়াশুনো করার কি দরকার?

হোস্টেলের ২১২ নম্বর রুম। ওরা ৬ জন থাকে। ফাহিম, সোহেল, ফখরুল, শামস, তন্ময়, সুজন। শেষের ৪ জন আবার কসাইবিদ্যার প্রচণ্ড চাপের মধ্যেও বাংলা মায়ের দামাল ছেলের ভূমিকায়ও নামে। রাজপথে লড়াকু কণ্ঠে দেশকে এগিয়ে নেয় বহুদূর। ফাহিম-সোহেল অবশ্য নিপাট ভালমানুষ। ডাক্তারি পড়ার পাশাপাশি ফাহিম আর যা করে তা হল, ফিফা খেলে। আর সোহেল হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বরিশালীয় প্রজাতির মানুষ। ইদানীং আবার মসজিদেও বেশি দেখা যাচ্ছে তাঁকে। দাড়ি-টুপিও রেখে দিয়েছে বেশ, চেহারার খোলতাই হয়েছে। ফাহিমকে ইদানীং রোগে পেয়েছে। কার সাথে চলে চলে একটু এগনোস্টিক টাইপ কথা শিখেছে। পুরো নাস্তিক হওয়া বোধ হয় সাহসে কুলাচ্ছে না। সংশয়-সন্দেহমূলক প্রশ্ন করা শিখেছে।

সন্ধ্যাবেলা। মাগরিব পড়ে সোহেল রুমে ঢুকেছে কেবল। পলিটিশিয়ানরা দেশ-জাতি উদ্ধার করতে একটু বাইরে আছেন। ফাহিম একটা বই পড়ছে। বই থেকে চোখ না সরিয়েই,

- সোহেল দোস্ত, তোরে একটা প্রশ্ন করি। মাইন্ড করতে পারবি না।
- কর। শিশুর প্রশ্নে বাপমা মাইন্ড করে না। নাস্তিকরা হল শিশুর মত। অবুঝ, অপরিণত। একই প্রশ্ন বার বার করে। তোর প্রশ্নের সুর দেখেই বুঝেছি তুই কি বিষয়ে প্রশ্ন করবি।

- 'আচ্ছা দোস্ত', ইগনোর করায় ফাহিমের জুড়ি নেই, 'ইসলাম তো **কল্যাণের ধর্ম**। তাইলে দাসপ্রথার মত অমানবিক জিনিস ইসলাম সাপোর্ট করে কিভাবে ?'

- তোর বুঝায় একটু ভুল আছে সোনা। ইসলামে দাসপ্রথার কনসেপ্টটা একটু আলাদা। তোরা ইসলামের দাসপ্রথা আর ইউরোপ-আমেরিকার দাসপ্রথাকে গুলিয়ে ফেলিস।'দাসপ্রথা' শব্দটা শুনলেই অ্যালেক্স হেলীর 'দি রুটস' আর হ্যারিয়েট স্টোর 'আংকেল টমস কেবিন' চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অত্যাচার-চাবুক-কোলের বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে বিক্রি-মৃত্যু। ইসলামী দাসপ্রথাটা একটু বুঝার আছে। সময় আছে তো কিছু, না কি?

- 'বল দেখি। ত্যানা পেচানো বয়ান আবার শুনি', অবজ্ঞার সাথে বই বন্ধ করল ফাহিম।

- দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস। আমাদের নবীজী বলেছেন : *দাস তোমার ভাই যে তোমার অধীনস্থ। তুমি যা খাও তা থেকেই তাকে খেতে দাও। তুমি যা পরিধান কর তা থেকেই তাকে পরাও। সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপিও না। সাধ্যের বাইরে কাজ হলে তাকে সাহায্য কর* [১]।

- অ্যাঁ?

- হাদিসে আরো আছে : *কেউ যদি তার দাসকে চড় দেয় বা পিটায় তার প্রায়শ্চিত্ত হল সে তাকে মুক্ত করে দেবে* [২]।

  একবার এক সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.), আমার দাসকে প্রতিদিন কতবার মাফ করব? উত্তর এলো, *প্রতিদিন ৭০ টা ভুল মাফ করবে* [৩]। আরো শুনবি?

- আর লাগবে না।

- 'আরে লাগবে না মানে', নিজের বিছানা থেকে উঠে ফাহিমের বিছানায় এসে বসল। 'আজ তোর একদিন কি আমার একদিন? আগে তোর মাথা থেকে ইসলামবিদ্বেষীদের ব্যাখ্যা সরিয়ে নিই।

  এমনকি তারা কষ্ট পাবে বলে তাদেরকে 'আমার দাস' এভাবে সম্বোধন করাও নিষেধ। ডাকার সময় এভাবে ডাকবে ' আমার বালক' বা 'আমার খাদিম' [৪]।

  উসমান (রা.) একদিন তাঁর দাসের কান মলে দিলেন। এরপর বললেন, 'এসো আমার কানও মলে দাও'। 'না, মালিক, পারবো না'। 'এসো বলছি (মলে দিল) এতো আস্তে না, জোরে। আমি কিয়ামতের দিন এর সাজা সইতে পারব না'।

দাসের উত্তর, 'মালিক আপনি যে দিনকে ভয় করেন আমিও তো সেদিনকে ভয় করি' [৫]।

- ওওওরে খাইছে।
- আরো শোন।

এক লোক খানা খাচ্ছিল। পাশে দাস দাঁড়িয়ে ছিল। খলিফা উমর (রা.) কঠিন ধমক দিলেন, 'দাসদের নিয়ে খানা খাও'।

আরেকদিন গভর্নর সালমান ফারসী (রা.) আটার খামির মাখাচ্ছিলেন। 'আরে গভর্নর স্যার, আপনি করছেন ?' 'দাসদের কাজে পাঠিয়েছি। একসাথে দুটো কাজ দিতে চাই না' [৬]।

- বুঝেছি। ইসলামিক দাসপ্রথা বুঝেছি।

- আচ্ছা। দেখবনে পরে কী রকম বুঝা বুঝেছিস। এখন ধর, তুই বার্মার সাথে যুদ্ধ করলি। 'হেরে গেলে দাস হতে হবে' এই ভয়ও একটা যুদ্ধ এড়ানোর কৌশল কিন্তু। তাও এড়ানো গেল না। যুদ্ধ শেষ। যুদ্ধবন্দীদেরকে কি করবি?
- চুক্তিসাপেক্ষে ফিরিয়ে দেব।
- চুক্তি করার কেউ নেই। তুই-ই বিজয়ী। শত্রু সম্পূর্ণ পরাজিত। রাজাও বন্দী। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তোর অধীন। যদি ১০০০০ যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করে দিস তাহলে আবার সংগঠিত হয়ে লড়াই করবে। কি করবি এখন?
- কারাগারে বন্দী করে রাখব। আর তো কিছু করার নেই?
- কতদিন পর্যন্ত রাখবি কারাগারে? মানে কতদিন পর্যন্ত ফ্রি খাওয়াবি ওদের?
- (আমতা আমতা)
- আচ্ছা ধর তোর অত বড় কারাগারই নেই?

. ফ্রি খাওয়ানোর প্রশ্নই আসে না। তাও শত্রুসেনাদেরকে।

. কারাগারে পর্যাপ্ত সুবিধা থাকলে সশ্রম করে দিয়ে প্রোডাকশনে লাগানো যেত।

. আবার ছেড়েও দিতে পারছিস না।

. বার্মিজগুলোকে বাঙালীও বানাতে পারছিস না যে, এখন নিজের লোক হয়ে গেছে। ছেড়ে দিলেও আর যুদ্ধ করতে আসবে না।

এখন কি করণীয়?

- আচ্ছা ভাই, তুই-ই বল।
- আমি যখন বলি ইসলামে সব যুগের সমস্যার সমাধান আছে তখন তো নাক সিঁটকাস। এই সমস্যাটা সেই যুগেও ছিল। শ্রেষ্ঠ সমাধানটা ইসলামই দিয়েছিল। এখনও যদি যুদ্ধ-যুদ্ধ সিচুয়েশান আসে। এখনও বেস্ট সমাধান এটাই।

কী সেটা?

১০০০০ শত্রুকে ১০০০০ সৈন্যের মালিকানায় দিয়ে দাও। যে পালতে পারবে সে রাখবে, যে পালতে পারবে না সে ধনী লোকের কাছে বিক্রি করে দিবে। ১০০০০ বন্দী শেষমেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তে কিছু পরিবারে ঠাঁই পাবে। জমিতে, কারখানায়, বাসায় কাজ করবে। আবার সংগঠিত হওয়ার সুযোগ রইল না।

এখন দেখ কতগুলো মানবিক উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে :

. এক, কারাগারের মত আটক থাকছে না। ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। বাজারঘাটে যাচ্ছে। তোদের লোহার গরাদের চেয়ে বেশি মানবিক।

. দুই, কারাগারে থাকলে অনির্দিষ্টকাল পচে মরতে হত। এখন মুক্তির অনেক সুযোগ।

- কি রকম?

- পান থেকে চুন খসলেই দাসমুক্তির বিধান দেয়া হলো :

. যদি দাসকে মারো তো প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে মুক্ত কর [৭]।

. কাউকে অনিচ্ছাকৃত মেরে ফেলেছ তো দাস মুক্ত কর [৮]।

. প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছ, দাস মুক্ত কর [৯]।

. রমজানে রোযা অবস্থায় স্ত্রীমিলিন করে ফেলেছ, দাস মুক্ত কর [১০]।

. ঝগড়ার সময় স্ত্রীকে একথা বলে ফেলেছ যে– 'আজ থেকে তুমি আমার মায়ের মত', প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে দাস মুক্ত কর [১১]।

. আর যাকাতের ৮ টা খাতের একটা তো আছেই যাকাতের টাকায় দাস কিনে মুক্তিদান [১২]।

. সূর্যগ্রহণের সময় দাস মুক্ত কর [১৩]।

. পরকালে সওয়াবের আশায় দাস মুক্ত কর [১৪]।

. আরও আছে, দাস চাইলে নিজেকে নিজে কিনে নিতে পারে। কুরআনে আল্লাহ আদেশ করছেন সূরা নূরে : *'যদি দাসরা নিজেকে মুক্ত করার চুক্তি করতে চায় তবে তা করো'*। [১৫]

. কারণে-অকারণে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দাস মুক্ত করা তো সাহাবাদের অভ্যাস ছিল। এক আবদুর রহমান বিন আওফ (রা.)ই ৩০০০০ দাস মুক্ত করেছেন। নবীজী (সা.) আর ৭ জন সাহাবী মিলে মুক্ত করেছেন ৩৯৩২২ জন দাস! আরো সোয়া লক্ষ